স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং হিন্দুধর্ম

ইউনিট 1

ভূমিকা :

সমস্ড় সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা রয়েছেন যাকে ঈশ্বর, পরমব্রহ্ম, ভগবান ইত্যাদি নামে আমরা আখ্যায়িত করি। তিনি এক ও অভিন্ন। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজিত। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তাঁর মহিমা অনন্ত ও অসীম।

প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। এই ধর্মমতে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও জগৎ সম্পর্কে রয়েছে নিজস্ব দর্শন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যার আলোকে এবং কালপরিক্রমায় হিন্দুধর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি অনন্যরূপ লাভ করেছে।

বর্তমান ইউনিটের পাঠ-১.১ এ স্রষ্টা এবং তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ-১.২, পাঠ-১.৩ -এ স্রষ্টার স্বরূপ, গুণ, শক্তি ও মহিমা এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ-১.৪, পাঠ-১.৫ এবং পাঠ-১.৬-এ হিন্দুধর্মের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পাঠ-১.৭ এ মানবজীবনের লক্ষ্য ও পূর্ণতা লাভের উপায় আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ ইউনিটের পাঠগুলো থেকে স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মানবজীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১:১ : স্রষ্টা, সৃষ্টি ও জগৎ
পাঠ- ১:২ : স্রষ্টার স্বরূপ, গুণ, শক্তি ও মহিমা
পাঠ- ১:৩ : হিন্দুধর্ম
পাঠ- ১:৪ : হিন্দুধর্মের উদ্ভব
পাঠ- ১:৫ : হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ
পাঠ- ১:৬ : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
পাঠ- ১:৭ : মানবজীবনের লক্ষ্য ও পূর্ণতা লাভের উপায়

পাঠ-১.১ স্রষ্টা, সৃষ্টি ও জগৎ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ভেতর যে ঐক্য রয়েছে তার সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবেন।
- বিচিত্র জগৎ ও জীবনের মূলে রয়েছেন যে স্রষ্টা বা ঈশ্বর তাঁর ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজ করেন, তাই সর্বজীবে সদ্ভাব রক্ষা করার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	স্রষ্টা, সৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতি, বৈচিত্র্য, পৃথিবী, সৌরলোক, মহাদেশ, শৃঙ্খলা, ঐক্য, আত্মা, ঈশ্বর, মহাবিশ্ব, জলদ, বিটপী ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

পৃথিবী নামক গ্রহে আমাদের বাস। পৃথিবীর বাইরে সৌরলোক, তার বাইরে রয়েছে অনন্তহীন মহাবিশ্বজগৎ। অপার বিস্ময় ও রহস্যে ভরা এ বিশ্বজগৎ। মহাকাশে রয়েছে চাঁদ, সূর্য, আরো কত গ্রহ-নক্ষত্র। রাতের আঁধারে দেখতে পাই অজানা কত নক্ষত্রমালা ! বিচিত্র এই বিশ্বপ্রকৃতি, বিচিত্র আমাদের পৃথিবী।

ছবি : প্রকৃতি

মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবীর আয়তন খুবই সামান্য। তবু আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি সেখানে রয়েছে কত অজানা বিষয় ! রয়েছে কত বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ। আছে বৈচিত্র্যে ভরা প্রকৃতি রাজ্য –সাগর-নদী, পাহাড়-বন, ঝর্ণাধারা, সমতল ও মরুভূমির মতো কত কিছু। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতিরাজ্যে ঘটে কত পরির্বতন। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ, বর্ষার বারিধারা, শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, হেমন্তে ঝড়া পাতার মর্মর ধ্বনি, শীতে কুয়াশার চাদরে ঢাকা প্রান্তর এবং বসন্তের নতুন কুঁড়িতে ভরে ওঠে বনবনানী। প্রাকৃতিক এই পরির্বতনের সঙ্গে প্রাণিজগতের মনোজগতের তথা অন্তর্গত পরির্বতন ধরা পরে। আবার এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশ মহাদেশের মধ্যে রয়েছে কত পার্থক্য। মানুষের ভাষা ও জীবনযাপনে, আকার-আকৃতিতে, সাদা-কালো, তামাটে বর্ণের মধ্যে তা ধরা পড়ে।

জীব ও জড় জগতের মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি তাদের মধ্যে গভীর ঐক্যও রয়েছে। সৌরলোকে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণ, দিন-রাত্রির পালাবদল, ঋতুচক্রের আর্বতন – এসব কিছুর মধ্যে একটি গভীর শৃঙ্খলা এবং ঐক্য রয়েছে।

এই যে অনন্ড় বিস্ময়কর বিশ্বপ্রকৃতি একটি গভীর শৃঙ্খলায় দিন-রাত্রি সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে চলছে, সৃষ্টি ও বিলয় ঘটছে এর মূলে রয়েছেন একজন মহান স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনিই ঈশ্বর । তিনিই জীব-জড়-বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক। তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে বিশ্বপ্রকৃতি, আমাদের জীবজগৎ ও পরিবেশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা সর্বদা বিদ্যমান রয়েছে। ঈশ্বর জীবের শুধু স্রষ্টা নন, তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করেন - এই উপলব্ধি থেকে কবি রজনীকান্ত সেন লিখেছেন–

" আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর-সলিল-গহনে।
আছ বিটপী-লতায় জলদের গায়
শশীতারকায় তপনে।"

সুতরাং আমরা জীব ও জগতের স্রষ্টা, সকল সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের কারণ এবং সবকিছুর নিয়ন্তা যে ঈশ্বর সেই মহান ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ করে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রচেষ্টা করব।

সারসংক্ষেপ :

প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে, জীব ও জগতের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি আবার গভীর ঐক্যও রয়েছে। এই বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মূলে একজন স্রষ্টা রয়েছেন। সকল কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারীকে আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর জীবের শুধু স্রষ্টা নন, তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন বলে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

পাঠ-১.২ স্রষ্টার স্বরূপ, গুণ, শক্তি ও মহিমা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, অবতার রূপে স্রষ্টার স্বরূপ জানতে পারবেন।
- ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ, শক্তি ও মহিমা জানতে পারবেন।
- স্রষ্টার সাকার ও নিরাকার রূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ব্রহ্ম, ভগবান, গুণ, মহিমা, পরমাত্মা, ওঙ্কার, অবতার, বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ, সর্বশক্তিমান, সাকার ও নিরাকার, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, দেব-দেবী ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

সৃষ্টিকর্তাকে সনাতন ধর্মে বা হিন্দুধর্মে ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম ও অবতার নামে অবিহিত করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি নামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব নামের মধ্যে স্রষ্টার যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ঈশ্বর : ঈশ্ ধাতুর সঙ্গে বরচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ঈশ্বর' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ঈশ্বর অর্থ সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সব কিছুর নিয়ন্ড়া। জীব ও জগতের ওপর তিনি প্রভুত্ব করেন বলে তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। তিনি জগতের আদি, তাই তিনি বিধাতা। তিনি নিজেকে নিজেই সৃস্টি করেছেন, তাই তাঁকে স্বয়ম্ভূ বলা হয়। ঈশ্বরকে পরমেশ্বর নামেও ডাকা হয়। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বরের অনন্ত গুণ, অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব এবং বিচিত্র তাঁর লীলা। ঈশ্বর নিরাকার, আবার তিনি প্রয়োজনে সাকারও হতে পারেন। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান। ঋগ্বেদে তাঁকে পরম পুরুষ এবং তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজিত তাই বলা হয়েছে।

ব্রহ্ম : 'বৃহত্বাৎ' ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ববৃহৎ। যাঁর থেকে বড় কেউ নেই। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় হয় তিনিই ব্রহ্ম। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ জগতের সবকিছু ব্রহ্মময়। ব্রহ্মের স্বরূপ হচ্ছে – তিনি নিত্য, শুদ্ধ, নিরাকার , সর্বব্যাপী , সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও জ্যোতির্ময়।

ব্রহ্মকে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ দর্শন থেকে উপনিষদে 'তত্ত্বমসি অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম' এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম' এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, একোহহম্" অর্থাৎ তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নাই। ব্রহ্মের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তিনি অনাদি, অনন্ত ও শাশ্বত। ব্রহ্মকে 'ওঙ্কার' বলা হয় যা সংক্ষেপে ওঁ রূপে উচ্চারিত। ওঁ এর মধ্যে রয়েছে অ-উ-ম, এর মানে ওঙ্কার বা ব্রহ্ম হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়কারী। সুতরাং সৃষ্টিক্রিয়া, পালনক্রিয়া ও বিলয় বা ধ্বংসক্রিয়ার মধ্যে ব্রহ্মের স্বরূপ নিহিত রয়েছে।

ভগবান: বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন তিনিই ভগবান। আবার স্রষ্টাকে যখন ঐশ্বর্য , বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধীশ্বররূপে কল্পনা করা হয়

তখন তাঁর নাম হয় ভগবান। 'ভগ' অর্থে এই ষড়-ঐশ্বর্যকে বুঝিয়ে থাকে। তাই এই ষড়-ঐশ্বর্য যার মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান।

ভগবান গুণময় এবং অশেষরূপের আধার। তিনি রসময়, আনন্দময় এবং দয়াময়। তিনি মঙ্গলদাতা। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান কাছে আছেন। ভক্ত তখন তাঁর অভীষ্টরূপ ভগবানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। ভক্ত ও ভগবানের মাঝে তখন মধুর সম্পর্ক রচিত হয়। স্রষ্টা ভগবান রূপে জীবে দয়া করে থাকেন।

অবতার : অবতার অর্থ অবতরণ করা। নিরাকার ঈশ্বর যখন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সাকার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তখন তাকে অবতার বলে। এ সকল অবতারীর রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। ধার্মিক ও ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানা রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে দশাবতারের কথা বলা হয়েছে যাঁদের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, বলরাম, বুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

দেব-দেবী : ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

" একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'

অর্থাৎ সত্য ব্রহ্ম এক, বিপ্রগণ বা জ্ঞানীগণ তাঁকে বহুনামে অবিহিত করেন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। এই ঈশ্বর অনন্ড় গুণের আধার। তিনি সমস্ড় শক্তির উৎস। তিনি নিরাকার আবার সাকার রূপেও বিরাজিত। দেব-দেবীগণ নিরাকার ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ বা সাকার রূপ। যেমন– ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, লক্ষ্মী ধন সম্পদের এবং সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নানা দেব-দেবীর পূজা করি, তাঁদের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করি।

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করেন। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন একজন শিল্পীর পরিচয় তার শিল্পকর্মের মধ্যে প্রকাশ পায়। অন্যভাবে বলা যায় কোনো শিল্পকর্মই শিল্পীকে পরিচিত করে, তাঁর নাম ঘোষণা করে। তেমনিভাবে এই সৃষ্টি ও জগতের মধ্যদিয়ে স্রষ্টাকে বা ঈশ্বরকে জানতে পারি এবং তাঁর মহিমা অনুভব করতে পারি।

তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

সারসংক্ষেপ :

স্রষ্টাকে আমরা ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান প্রভৃতি নামে ডাকি। এ সব নামের মধ্যে স্রষ্টার নানা বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। স্রষ্টা অনন্তগুণের আধার এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নিরাকার আবার সাকার রূপও ধারণ করতে পারেন। দেব-দেবীগণ নিরাকার ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার সাকার রূপ। পরমাত্মা জীবদেহে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠ-১.৩ হিন্দুধর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হিন্দুধর্ম ও সনাতনধর্মের নামের অর্থ জানতে পারবেন।
- সাকার-নিরাকার এর পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
- সাধনপথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য একই তা বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	হিন্দুধর্ম, সনাতন, সিন্ধু, উপাসনা, পূজা, বেদ, উপনিষদ, সাধনপথ, মুক্তি, ধর্মগ্রন্থ, অহিংসা. শাস্ত্র, দর্শন, মতবাদ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' অর্থ চিরন্তন অর্থাৎ যে ধর্মটি অনেক পূর্ব থেকে ছিল, এখনো আছে এবং ভাবীকালেও থাকবে – এমন ধারণা থেকে এ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে সনাতন ধর্ম।

সনাতন ধর্ম বর্তমান কালে হিন্দুধর্ম নামে সমধিকভাবে সারাবিশ্বে পরিচিত। হিন্দু শব্দটি স্থানবাচক। সিন্ধু শব্দটি থেকে হিন্দু (Hind) শব্দটি এসেছে। সুপ্রাচীন কালে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি সভ্য জনগোষ্ঠী বসবাস করতো। ভারতের বাইরে থেকে আগতরা তাদের হিন্দু নামে অভিহিত করতেন। এই অঞ্চলের মানুষের ধর্ম, দর্শন ও বিশ্বাসই হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। এভাবে সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

হিন্দুধর্ম কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেনি। এ ধর্মের একক কোনো প্রবর্তকও নেই। সুপ্রাচীন কাল থেকে নানা মত ও পথের সমন্বয়ে এই ধর্মমত গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ভারতীয় মহাদেশের আদি বাসিন্দাদের যেমন অবদান রয়েছে তেমনি পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসা আর্য জাতির অবদান রয়েছে। বর্তমানে হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রানুমোদিত বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম সাধনা, পূজা কিংবা উপাসনা করেন এবং ইহলোক ও পরলোক সম্পর্কিত এর দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরাই হিন্দু নামে পরিচিত। আর তাঁদের ধর্মই হিন্দুধর্ম।

হিন্দুধর্ম একদিকে যেমন অতি প্রাচীন তেমনি সবচেয়ে নবীন ধর্মও একে বলা চলে। কেননা, এ ধর্মের কালে কালে নানাবিধ সংস্কার সাধিত হয়েছে। ধর্মীয় বহু মনীষার শ্রম ও সাধনায় একে যুগোপযুগী করে তোলায় অতি প্রাচীন কুসংস্কারসমূহ কাটিয়ে বর্তমানে নবরূপে এ ধর্মটি এগিয়ে চলছে।

হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ চার ভাগে বিভক্ত, এগুলো হচ্ছে – ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুধর্মের দার্শনিক দিক, বিধি-বিধান, বিশ্বাসসমূহ তথা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মের মূলে আছেন ঈশ্বর বা স্রষ্টা যিনি সবকিছুর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংসের নিয়ন্তা। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি এক এবং অভিন্ন।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তবে সাকার রূপেও তিনি রূপ ধারণ করতে পারেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় সাধন করে থাকেন। ঈশ্বর অনন্ড় গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। দেব-দেবীগণ ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের সাকার রূপ। তাঁর জ্ঞানের রূপকে আমরা সরস্বতী, সম্পদের রূপকে লক্ষ্মীদেবী রূপে পূজা করে থাকি। হিন্দুধর্মে নানা মত ও নানা পথে সাধনা করা হলেও একই ঈশ্বরের সাধনা করা হয়। কেননা, দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। নানা মত ও নানা পথ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পার্থকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ (৪/১১)

অর্থাৎ হে পার্থ, যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাকে সেভাবেই আমি তুষ্ট করে থাকি। মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে থাকে।

সুতরাং হিন্দুধর্মে নানা ধর্মীয় উপাসক, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলেও মূলত তাঁরা একই পরমেশ্বরের পথে ধাবিত হচ্ছে। জ্ঞানী তাঁর জ্ঞানযোগের দ্বারা, ভক্ত তাঁর ভক্তিযোগের দ্বারা এবং কেউ বা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভের চেষ্টা করেন। তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ধর্মের দার্শনিক মতে ও পরম বিশ্বাসে সুগভীর মিল বা ঐক্য রয়েছে। যেমন–হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে আত্মার বিনাশ নেই। আত্মা অমর, অজর, অবিনশ্বর; শুধু বিনাশ হয় দেহের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরির্বতন করে নতুন কাপড় পরিধান করে আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মার এই দেহ পরির্বতনই জন্ম ও মৃত্যু রূপে হিন্দুধর্মে চিহ্নিত। হিন্দুধর্মে একেই বলে জন্মান্তরবাদ। সাকার ও নিরাকার রূপে ঈশ্বরের সাধনা করা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার জন্মান্তরবাদও এ ধর্মের একটি মূল ভিত্তি।

হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে, নরনারায়ণ–যিনি নর তিনিই নারায়ণ অর্থাৎ নরের মধ্যেই নারায়ণ রয়েছেন আবার 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' অর্থাৎ যেখানেই জীব সেখানেই শিব (ঈশ্বর) বলা হয়েছে। জীবের হৃদয়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। হিন্দুধর্মের একটি প্রধান শিক্ষা ও বিশ্বাস হচ্ছে– জীবের ভিতরে ঈশ্বর আছেন। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। এই জ্ঞান থেকে সবার প্রতি অহিংসা ও ভালোবাসা তৈরি হয়।

হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ সাধন করা। এই ধর্মে বলা হয়েছে, 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ আত্মার মুক্তি ও জগতের হিত সাধন করাই যথার্থ ধর্ম। এই কথা মনে রেখে আমরা জগতের কল্যাণ ও আত্ম-উন্নতি সাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

সারসংক্ষেপ :

হিন্দুধর্মের আদি নাম সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের একক কোনো প্রবর্তক এবং নির্ধারিত একক কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। ঈশ্বর হিন্দুধর্মের মূল। নিরাকার এবং সাকাররূপে ঈশ্বরের উপাসনা এই ধর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আত্মার অমরতা, জন্মান্ড়রবাদ, শিবজ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ চার ভাগে বিভক্ত, এইগুলো হচ্ছে– ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুধর্মের দার্শনিক দিক, বিধি-বিধান, বিশ্বাসসমূহ তথা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

পাঠ-১.৪ হিন্দুধর্মের উদ্ভব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিন্দুধর্ম কীভাবে এবং কখন উদ্ভব হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম যে একই ধর্ম তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ভারতবর্ষ, সিন্ধুসভ্যতা, ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ব, লিপিমালা, দ্রাবিড়, আর্যধর্ম, আর্যভাষা, জন্মান্তরবাদ, ঐতিহ্য, প্রাচীনতম, পূজা, বহিরাগত ইত্যাদি।

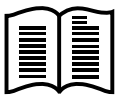

বিষয়বস্তু :

হিন্দুধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে। এ উপমহাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি ধর্মেরও জন্মস্থানরূপে পরিচিত। তবে হিন্দুধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মরূপে আজও বহাল রয়েছে।

হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ধর্ম। এ ধর্মের একক কোনো প্রবর্তক না থাকায় ঠিক কখন হিন্দুধর্মের উদ্ভব হয়েছে বলা সম্ভব নয়। তবে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের পরে এ ধর্ম বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু পর্যন্ত তথা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধু, বিপাশা প্রভৃতি নদী কেন্দ্রিক ও হিমালয়, বিন্ধ্য পর্বতমালা পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষে যে সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল তাই সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচত। ভারতবর্ষের এই সভ্যতার বয়স কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর ধরা হচ্ছে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে বিকাশ লাভ করেছিল। বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু নদের তীর থেকে পাঞ্জাবের ইরাবতী নদী পর্যন্ত প্রাচীন এ নগর সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ নগর সভ্যতার নির্মাণকারীদের ধর্ম বিশ্বাসই সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি। এ নগর কেন্দ্রিক সভ্যতায় নারী মূর্তিই ছিল প্রধান উপাস্য দেবী। পূজা পদ্ধতি, যোগসাধন পদ্ধতি, তন্ত্রের ধারণা, জন্মান্তরবাদ, বহু দেব-দেবীর ধারণা সবই বৈদিকপূর্ব সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত। ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি ও উপজাতীয়দের দ্বারা এ ধর্মদর্শন ও নগরকেন্দ্রিক সিন্ধু সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

অনেকে মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে পশ্চিম হতে বহিরাগত এক নতুন জাতি ভারতবর্ষে এসে সিন্ধু অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সিন্ধু সভ্যতাকে পর্যুদস্ড় করে। তৎকালীন সিন্ধু কেন্দ্রিক নগর সভ্যতাকে ধ্বংস করে যারা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল অনুমান করা হয় তারা বৈদিক সংস্কৃতির বাহক আর্যজাতি ছিল। বহিরাগত এই আর্যগণ সিন্ধু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঋণ পরবর্তীতে স্বীকার করে তাদের ধর্মদর্শনের সঙ্গে একীভূত করে নেয়। ফলে সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্মের সঙ্গে আর্যদের বিশ্বাস আচার-আচরণ মিলিত হয়ে একটা নতুন ধর্মরূপ লাভ করে। আর্যদের কোনো লিপিমালা না থাকায় পূর্ববর্তী দ্রাবিড়ীয় লিপিমালায় তাদের ভাষা লিখিত রূপ পায়। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার মূল ভারতের বাইরে হলেও হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি এ আর্যভাষায় লিখিত হওয়ায় হিন্দুধর্মের ধর্মীয় ভাষা হিসেবে তা স্থায়ী রূপ লাভ করে। এটিই পরবর্তীতে আর্য সভ্যতা, আর্যধর্ম নামে ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় উপাদান, বিশ্বাস, সংস্কার, পূজা-পার্বণ আর্যগণ গ্রহণ করে এবং আর্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে ধর্মীয় রূপ লাভ করেছে তাই আজকের হিন্দুধর্ম তথা সনাতন ধর্ম। সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত নানা মত, নানা পথ ও বিধি-বিধানের সমন্বয়ে সনাতন ধর্ম গড়ে উঠেছে। তাই এ ধর্মের রয়েছে সুদীর্ঘ সময়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য।

হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাস। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আবার সাকার রূপে অবতার, দেব-দেবীর রূপ ধারণ করতে সক্ষম। হিন্দুধর্ম এক ঈশ্বরবাদী হয়েও সাকার উপাসনার কারণে এ ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে ব্যতিক্রমী রূপ লাভ করেছে। ঈশ্বর সকল জীবের স্রষ্টা এবং জীব দেহে তিনি আত্মারূপে অবস্থান করেন। জীবের এই আত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার অংশ। তাই আত্মার বিনাশ নেই, আত্মা অমর ও অবিনশ্বর–হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস। আত্মার দেহ পরিবর্তনে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। হিন্দুধর্মে একে জন্মান্ড্ররবাদ বলা হয়েছে। মোক্ষ লাভের মধ্য দিয়ে জীবের ঈশ্বর প্রাপ্তি বা চিরমুক্তি ঘটে থাকে। অর্থাৎ পুনর্জন্ম না হওয়ায় হইলোকে ও পরলোকের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার লাভ করেন।

সারসংক্ষেপ :

হিন্দুধর্মের জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশে। প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি সুপ্রাচীন জাতি ও উপজাতির হাতে গড়ে উঠা সিন্ধু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত আর্যজাতির বিশ্বাস ধ্যান ধারণার সংমিশ্রণে সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আত্মার অমরতা, মোক্ষচিন্তা, জন্মান্তরবাদ, পরমাত্মায় বিশ্বাস হিন্দুধর্মের নিজস্ব দর্শন।

পাঠ-১.৫ হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- হিন্দুধর্মানুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- হিন্দুধর্মের নানা মত ও পথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- হিন্দুধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ যেসব গ্রন্থে রয়েছে তাদের সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ক্রমবিকাশ, প্রাচীন, নবীন, প্রবর্তক, আত্মতত্ত্ব, স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ, যজ্ঞ, পুষ্পকর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের সিন্ধু সভ্যতার সময়ে উদ্ভূত সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। কিংবা অতি পুরাতন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও এ ধর্ম এ সময়ে অচল হয়ে পড়েনি। বরং সময়ের সাথে সাথে সংযোজন বিয়োজনের মধ্য দিয়ে এ ধর্মটি ক্রমবিকশিত হয়ে সবেগে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। এ ধর্মমতে যেমন অতি প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে অর্থাৎ তার সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে তেমনি নবীন আর্দশ গ্রহণ করে নিয়েছে। সে কারণে এ ধর্মটি পৃথিবীর যেমন সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম একই সঙ্গে সবচেয়ে নবীন ধর্মও এটি। এ ধর্মের একক কোনো প্রবর্তক ও ধর্ম নির্দেশিত কোনো একক গ্রন্থ না থাকায় যুগে যুগে ধর্ম মনীষীগণ এর নানা সংস্কার সাধন করে যুগোপযোগী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এটি এই ধর্মের অনুসারীগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার দিক বলা যেতে পারে।

হিন্দুধর্ম নানা মত ও পথের সমন্বয়ে উদ্ভূত। এ ধর্মে যেমন সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম বিশ্বাস গৃহীত হয়েছে তেমনি পরবর্তীতে বাইরে থেকে আগত আর্য জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও প্রথা যুক্ত হয়েছে। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করে তখন স্থানীয় সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এবং পরবর্তীতে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে একটা সমন্বয় ঘটে। ফলে হিন্দুধর্ম একটা নতুন রূপ লাভ করে।

বেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্ম গ্রন্থ। বৈদিক গ্রন্থসমূহ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ববেদে হিন্দুধর্মের সাধারণ নিয়মাবলি বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদে পরম ব্রহ্ম ও আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগে দেব-দেবী তথা অবতার তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ বা মুক্তি অর্জন। এ কারণে মোক্ষ লাভের জন্য একসময়ে সব ধরনের কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের পথ নির্দেশিত হয়। কেননা কর্ম করলে যেহেতু কর্ম ফলের প্রতি মোহ তৈরি হয় সে কারণে উপনিষদে ঋষিগণ এমনটি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু জগতে কর্মের বিকল্প নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাই নিষ্কাম কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈদিক যুগে উপাসনার পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ ভিত্তিক। ঋষিরা দেবাতাদের শক্তি স্মরণ করে মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের স্তুতি করতেন। যজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করে বাঞ্ছিত দেবতার কাছে তা নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন। বৈদিক দেবতাদের তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা–

১) স্বর্গের দেবতা

২) অন্তরীক্ষের দেবতা

৩) মর্ত্যের দেবতা

স্বর্গের দেবতাগণ কখনই পৃথিবীতে আসেন না, কেবল তাঁদের ক্ষমতা বোঝা যায়। যেমন- সূর্য, বরুণ ইত্যাদি। অন্তরীক্ষের দেবতাগণ পৃথিবীতে আসেন কিন্তু অবস্থান করেন না। যেমন- ইন্দ্র ও বায়ু। মর্ত্যের দেবতাকে পৃথিবীতে দেখা যায়। তিনি পৃথিবীতে অবস্থানও করেন। অগ্নিকে পৃথিবীতে পাওয়া যায় বলে তাঁর দ্বারা অন্য দেবতাদের আহ্বান করা হয়। যজ্ঞের অগ্নিতে বিভিন্ন দ্রব্য দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। এই পদ্ধতিতে উপাসনা করাকে যজ্ঞ বা হোম বলে। বেদিক যুগে এই যজ্ঞ ভিত্তিক প্রার্থনা প্রচলিত ছিল।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সারম্ভরে যে পূজা ও উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তা বৈদিক যুগ থেকে ভিন্নতর। পূজা শব্দের অর্থ পুষ্পকর্ম। পূজা পদ্ধতির প্রচলন ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতার সময়ে ঘটেছে, যা পরবর্তীতে পৌরাণিক যুগে ব্যাপক রূপ লাভ করে। বর্তমানে আমরা দেব-দেবীর যে পূজা উদ্‌যাপন করি তার সঙ্গে যজ্ঞও যুক্ত হয়েছে। এভাবেই প্রচীন ভারতীয় ধর্মীয় রীতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির সমন্বয় করে নেওয়া হয়েছে।

উপাস্য দেবতা অনুসারে হিন্দুধর্মের মধ্যে নানা মত ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা শক্তির উপাসনা করেন তাঁরা শাক্ত, যাঁরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁরা বৈষ্ণব এবং শিবের উপাসনা করেন তাঁরা শৈব ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটলেও এ সকল দার্শনিক মত ও বিশ্বাসের মধ্যে গভীর ঐক্য বিদ্যমান। এই ঐক্যের সূত্রটি হলো এই যে, সকল দেবতা হচ্ছেন এক এবং অভিন্ন পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শক্তি। এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই হিন্দুধর্মের মূল।

পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে হিন্দুধর্মের বিকাশের পরিচয় মেলে। পৌরাণিক যুগে দেবতার বিগ্রহকে মন্দিরে স্থাপন এবং পুষ্পপত্র, ফল-ফুল, নৈবেদ্যে উপাসনার বিস্ড়র ঘটে। যজ্ঞ, পূজা, ঈশ্বর ও দেবতাদের গুণকীর্তন, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশের পরিচয় রয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

হিন্দুধর্মকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন একই সঙ্গে সবচেয়ে নবীন ধর্মরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ধর্মমত ও সাধনপথের সাথে আর্যজনের কৃষ্টি ও বিশ্বাসের সংমিশ্রণে সনাতনধর্ম বা হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে। অতি প্রাচীন মত ও নতুন আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সনাতনধর্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। নানা মত, নানা পথ এবং নানা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে হিন্দুধর্ম মানবসমাজে বহমান রয়েছে।

পাঠ-১.৬ হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিন্দুধর্মের মূলে কী বিশ্বাস রয়েছে তা জানতে পারবেন।
- অবতার, দেব-দেবীর বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জন্মান্তরবাদ এবং স্বর্গ-নরকের বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হিন্দুধর্মের অন্যান্য বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	দর্শন, বিধিবিধান, রীতি, অবতারবাদ, মূলভিত্তি, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অমরতা, অবিনশ্বর, কর্মফল, ধ্যান, তন্ত্র, দশবিধ-সংস্কার, পারলৌকিক কর্মকান্ড ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস কেন্দ্রিক কতগুলো আচার, বিধিবিধান, সাধন পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে মানব জগতে বহু ধর্মমত বহমান রয়েছে। জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করে এসব ধর্মের নিজস্ব দর্শন (Philosophy) রয়েছে, রয়েছে অতি প্রাকৃতিক তথা অলৌকিক (Myth) ক্ষমতায় বিশ্বাস। আবার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পালনীয় ধর্মীয় রীতি (Rituals) এবং সামাজিক ও পারিবারিক বিধিবিধান (Codes) রয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় দর্শন, অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস, ধর্মীয় রীতি ও বিধিবিধানের আলোকে বিচার, বিশ্লেষণ করলে ধর্মসমূহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়ে। হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

"ধর্মমূলো হি ভগবান্, সর্ববেদময়হরিঃ " অর্থাৎ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তিতে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ড়া। তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং সকল জীবের অন্তরাত্মা। সুতরাং হিন্দুধর্মের মূলে একজন স্রষ্টা বা ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে।

ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার–উভয় রূপেই বিরাজ করতে পারেন। সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা অন্য ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভক্তের ভাগ বা শ্রেণি অনুসারে সাকার ও নিরাকার রূপে ঈশ্বর পূজিত হয়ে থাকেন। জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে তিনি করুণাময় ভগবান রূপে পূজিত হন।

হিন্দুধর্মে অনেক দেব-দেবী রয়েছেন যাদের অনন্তগুণ ঈশ্বরের এক একটি গুণের সাকার রূপ হিসেবে হিন্দুগণ পূজার্চনা করে থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-দেবী ঈশ্বরেরই এক একটি গুণের বা ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ রূপে পূজিত হয়ে থাকেন।

হিন্দুধর্মে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অবতারবাদে বিশ্বাস করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (গীতা-৪/৭)
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা-৪/৮)

যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় ও অধর্মের উত্থান ঘটে তখন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান অবতাররূপে পৃথিবীতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ , বলরাম, বুদ্ধ প্রভৃতিকে ঈশ্বরের অবতাররূপে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয়।

আত্মা এবং পরমাত্মায় বিশ্বাস হিন্দুধর্মের আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা হিন্দুধর্ম গভীরভাবে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর, পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মার অংশ হিসেবে আত্মা জীবদেহে জীবাত্মা রূপে অবস্থান করেন। তাই পঞ্চভূতে তৈরি দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অবিনশ্বর; তার জন্ম ও মৃত্যু নেই। মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ উৎসস্থল পরমাত্মার সঙ্গে মিলন না হওয়া পর্যন্ত বার বার দেহ পরিবর্তন করে। আত্মার মুক্তি ঘটে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর বা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

আত্মা মুক্তি লাভের পূর্বে বহুবার দেহ ধারণ করে থাকে এবং দেহ পরিবর্তন করে থাকে। এই দেহ ধারণ ও পরিবর্তনকেই জন্ম ও মৃত্যুরূপে হিন্দুধর্মে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আত্মার অমরতা এবং জন্ম ও মৃত্যুকে নির্ভর করে জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদ একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।

হিন্দুধর্মে স্বর্গ ও নরক তথা পরোকালে বিশ্বাস করা রয়েছে। এধর্মে ইহলোককে ঈশ্বরের কর্মক্ষেত্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মানুষ এখানে কল্যাণকর্মের জন্য পুণ্যলাভ করে এবং তা ভোগের জন্য মৃত্যুর পরে তার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। আবার পাপ কর্মের জন্য মানুষকে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হয়। মৃত্যুর পরে শাস্ড়ি ভোগের জন্য যে স্থানে যেতে হয় তাকে নরক বলে। সুতরাং মানুষের পুণ্যকর্ম ও মন্দকর্মের ফল ভোগের জন্য স্বর্গ ও নরক নির্ধারিত রয়েছে।

হিন্দুধর্মে স্বর্গ, নরক এবং জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্মবাদের সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। আত্মার অমরতা, অবতার, দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাসের ন্যায় কর্মবাদেও গভীরভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে। এই কর্মবাদের মূলকথা হলো – কর্মকর্তাকে তার আপন কর্মফল ভোগ করতে হবে। ভালো হোক, মন্দ হোক, যে যেমন কর্ম করবে তাকে তেমন ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সুতরাং কর্মবাদ অনুসারে মানুষের আপন কর্মই তার বিধিলিপি। তাই কর্মবাদ হিন্দুধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ।

উল্লিখিত বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও হিন্দুধর্মের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা এ ধর্মের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছে – যেমন হিন্দুধর্মের রয়েছে নিজস্ব উপাসনা এবং সাধনার পদ্ধতি। ধ্যান, নামজপ, তন্ত্র, পূঁজা, সন্ধ্যারতি, প্রার্থনা ইত্যাদির মতো অনেক কিছু। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত কর্মকান্ড রযেছে। এর মধ্যে জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত সময়ে রয়েছে দশবিধ সংস্কারকর্মাদি। তিল, তুলসি, গঙ্গাজল ও অগ্নি সহযোগে বিবাহকর্মের নিজস্ব রীতি রয়েছে। রয়েছে মৃত্যুর পর শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতি এবং শ্রাদ্ধাদির মতো পারলৌকিক কর্মকান্ড। ধর্মীয় দর্শন এবং নানাবিধ এরূপ ক্রিয়া কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

"ধর্মমূলো হি ভগবান্"– হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তিতে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন। তাঁকে সাকার ও নিরাকার উভয়রূপে আরাধনা করা হয়। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদে বিশ্বাস এ ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । নানা মত ও নানা পথে ঈশ্বরের আরাধনা করা হিন্দুধর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের বিশ্বাস, উপাসনা রীতি, জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মন্ডিত কর্মকান্ড যা অন্য ধর্ম থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

পাঠ-১.৭ মানবজীবনের লক্ষ্য ও পূর্ণতা লাভের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানবজীবনের লক্ষ্য জানতে পারবেন।
- লক্ষ্য অর্জনে কর্মের ভূমিকা জানতে পারবেন।
- জীবনকে পরিপূর্ণ করার উপায় জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	সাফল্য, ইহজাগতিক, পরমার্থিক, চতুরাশ্রম, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মক্ষেত্র, অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, সাধনা, কল্যাণ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু :

ইহজগতে মানুষ স্বভাবত সফল ও সার্থক জীবন প্রত্যাশা করে। কিন্তু কর্মহীন, সাধনাহীন, জ্ঞানহীন জীবনে সাফল্য ও সার্থকতা অসম্ভব। জীবনে পূর্ণতালাভের জন্য চাই প্রাণপণ প্রচেষ্টা। নানা মাত্রিক দক্ষতা, গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন সাফল্য মন্ডিত হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর অনন্ত গুণের আধার। তিনি মানবদেহে আত্মারূপে বিরাজমান। তাই ঈশ্বরের অনন্তগুণকে সাধনার দ্বারা ব্যক্তি জীবনে বিকশিত করে তোলাই মানুষের ধর্ম, মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য। কেননা এই সাধনার দ্বারাই ইহজাগতিক কল্যাণ ও পরমার্থিক মুক্তি লাভ করা সম্ভব। ধর্মের এ মূলবাণী বুঝতে না পারার জন্যই আমরা জীবনে পিছিয়ে পড়ছি, দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হচ্ছি।

স্বামী বিবেকান্দের মতে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবগুণের বিকাশ সাধনই হচ্ছে ধর্ম। তিনি আরো বলেন, আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস এদুটি জিনিসই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।

ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে,'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণের জন্য আমরা ধর্ম পালন করি। তাই মানবজীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আত্মিক মুক্তি ও জগতের কল্যাণ সাধন করা।

জীবনকে সার্থক ও গৌরবময় করার জন্য ধর্মগ্রন্থে নানা পথের কথা বলা হয়েছে। ইহজাগতিক ও পারমার্থিক বিষয় বিবেচনা করে সমগ্র জীবনকে চতুরাশ্রমে ভাগ করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মে মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য চারটি সাধন পথের নির্দেশ ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) কর্মযোগ, (২) জ্ঞানযোগ, (৩) ভক্তিযোগ ও (৪) রাজযোগ। এই সাধন পদ্ধতির যে-কোনো একটি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে একজন সাধক মোক্ষলাভ করতে পারেন। তবে আধুনিক সময়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পথ ভিন্ন এই কর্মময় জগতে জীবনকে সফল ও সার্থক করা সম্ভব নয়। তাই এ দুটি যোগের তাৎপর্য অপরিসীম।

বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের বিরাট কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে নানা কর্ম ও সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনে গুণ ও জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর গুণ ও জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তুলতে হয়। তাই বলা হয়ে থাকে, মানবজীবন কর্মেরই ফলাফল। কর্ম ও সাধনার দ্বারা গুণ ও জ্ঞান অর্জিত হয়। দক্ষতা, গুণ ও জ্ঞান অর্জন করে মানুষ সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্য-দর্শনে, বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতায় মধ্য দিয়ে ইহলৌকিক জীবনকে সার্থক ও সফল করে তোলে।

জীবন ধারণের জন্য বর্তমান জগতে কর্মের কোনো বিকল্প নেই। তাই কর্মই জীবন। গীতায় (২/৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহমুক্তভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও শাস্ত্রমতে চারটি সাধন পদ্ধতির যে-কোনো একটি উপায়ে মোক্ষলাভ ঘটে, তবু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় জ্ঞানের পথকে এবং জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন (গীতা-৭/১৭)। গীতায় জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির উদ্দেশে বলা হয়েছে-

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ (গীত-৪/৩৯)

অর্থাৎ, যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে শীঘ্রই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

বৈশেষিক দর্শনেও বলা হয়েছে, 'যতোহভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়সিদ্ধিঃ সঃ ধর্মঃ' অর্থাৎ যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ জাগতিক কল্যাণ এবং নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভ হয় তাই ধর্ম। সুতরাং হিন্দুধর্মে জাগতিক কল্যাণ ও আত্মিক মুক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিজের মুক্তি ছাড়া যেমন জাগতিক উন্নতি অর্থহীন তেমনি জগতের কল্যাণ না করে ব্যক্তির মুক্তি গুরুত্বহীন। বিশ্বজগতে কর্মের দ্বারা মানবজীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলা যায় তেমনি সাধনার দ্বারা চরম লক্ষ্য যে মোক্ষলাভ তাও অর্জন করা সম্ভব। হিন্দুধর্মে জাগতিক কল্যাণ ও মোক্ষলাভের মধ্য দিয়ে জীবনে পূর্ণতালাভের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'– আত্মিক মুক্তি ও জগতের কল্যাণ সাধনই মানবজীবনের লক্ষ্য। মানবজীবন হচ্ছে কর্ম ও সাধনার ফলাফল। কর্ম ছাড়া জীবন ধারণ ও মুক্তি অসম্ভব। কর্মের দ্বারা গুণ ও জ্ঞান লাভ হয়; গুণ ও জ্ঞান অর্জিত হলে জীবন সাফল্য মন্ডিত হয়ে ওঠে এবং পরম শান্তি লাভ হয়। তাই কর্ম ও সাধনার দ্বারা মানবজীবনের সাফল্য ও পূর্ণতা অর্জিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট : ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রকৃতি, পরিবেশ ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মূলে কে আছেন ?
ক. সূর্য খ. চন্দ্র গ. ঈশ্বর ঘ. মানুষ

২. "হিন্দু" শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ?
ক. হিন্দোল খ. সিন্ধু গ. বিন্দু ঘ. বিন্ধ্য

৩. ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ–
i) তিনি সর্বত্র বিরাজিত ii) তিনি জীবের অন্তরাত্মা
iii) তিনি ঘরে ঘরে বাস করেন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৪. হিন্দুধর্মের গ্রন্থ কোন ভাষায় রচিত ?
ক. বাংলা ভাষায় খ. বৈদিক ভাষায় গ. সংস্কৃত ভাষায় ঘ. বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায়

৫. পূজা কারা প্রচলন করেন ?
ক. দ্রাবিড়গণ খ. আর্যগণ গ. দেবতারা ঘ. মোগলরা

৬. জীবকে ভালোবাসার মূল কারণ হচ্ছে –

i) যত্র জীব তত্র শিব ii) পশুপ্রীতি

iii) ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii

গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

সমৃদ্ধি প্রতিদিন ঠাকুরকে প্রণাম করে পড়তে বসে। গভীর রাত পর্যন্ত সে পড়ালেখা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে।

৭. সমৃদ্ধির মধ্যে হিন্দুধর্মের কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে?

ক) কর্মযোগ খ) ভক্তিযোগ

গ) রাজযোগ ঘ) কোনটিই নয়

৮. সমৃদ্ধির ভালো ফলাফলের মূলে রয়েছে –

i) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ii) সঠিক কর্তব্য পালন

iii) কেবলমাত্র ঈশ্বরের স্মরণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) iii ও i

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন : ১

হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। সিন্ধু নদের তীরে বসবাসকারী মানুষের ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্মের পরিচিতি বিশ্বময়। হিন্দুধর্মের দর্শন, বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্য সুবিদিত হলেও প্রবর্তকদের নাম মহাকালে হারিয়ে গেছে।

ক) সনাতন শব্দের অর্থ কী?

খ) হিন্দুধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে লিখুন।

গ) 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'–এর ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) হিন্দুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ ২

জ্ঞানী, ভক্ত এবং যোগীর নিকট ঈশ্বরের রূপ ভিন্ন ভিন্ন। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসকর্তা। বিশ্ববৈচিত্র্যের মূলে রয়েছেন ঈশ্বর, যাঁকে মানুষ নানা রূপে অনুভব করে।

ক) ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

খ) ভক্তের নিকট ঈশ্বরের রূপ কী?

গ) আপনার অনুভূত ঈশ্বরের রূপ বর্ণনা করুন।

ঘ) বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগতের মূলে যে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর রয়েছেন – তাঁর বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ : ১. (গ), ২. (খ), ৩.(গ), ৪. (ঘ), ৫. (ক), ৬. (গ), ৭ (ক ও খ), ৮ (গ)